আমিত্বের ব্যঞ্জনায় নজরুলের ‘বিদ্রোহী’

ইরানী বিশ্বাস

‘আমি’ শব্দটিকে ব্যঞ্জনাময় প্রতীকে রূপান্তরের মাধ্যমে নিজেকে অজেয় উপলব্ধির এক আত্মশক্তির ঘোষণা *‘বল বীর, বল উন্নত মম শির’*।

ডিসেম্বর ১৯২১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলেও তার রেশ তখনও কাটেনি। বিভিন্ন সভায় নানান মানুষের বক্তৃতা পর্যবেক্ষণ আর বাড়ি ফিরে বই পড়া ছিল নজরুলের কাজ। তৎকালীন কলকাতার ৩/৪ তালতলা লেন, নিচতলায় ছোট একটি রুমে কমরেড মুজফফর আহমেদের রুমমেট ছিলেন যুবক নজরুল। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। প্রকৃতি যেন বেঁকে বসলো। কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড বৃষ্টি। চারিদিকে তখন বরফ শীতলতা। এমনই এক বৃষ্টিময় শীতের রাতে জন্ম হয়েছিল নজরুলের আগুন ঝরা কবিতা ‘বিদ্রোহী’।

‘বিদ্রোহী’ কবিতায় নজরুলের বিদ্রোহচেতনা শক্তির উন্মোচন ঘটেছিল। এ কবিতার মাধ্যমে তিনি ভারতীয় এবং পশ্চিম এশীয় পুরাণ ও ইতিহাস থেকে শক্তি সঞ্চয় করে প্রবল বিদ্রোহবাণী ঘোষণা করেছেন। তিনি মূলত ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে, শৃঙ্খলিত আমিত্বের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। তাইতো তিনি বলেছিলেন:

‘শির নেহারী আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রীর’

শুরুতেই তিনি সবচেয়ে বড় বিপ্লবের কথা বলেছেন। সেই বিপ্লবে গর্জে ওঠা শক্তির কাছে সকল পরাশক্তি তুচ্ছ। কবিতার ভাষায়, আমার উন্নত শির দেখে হিমালয় পর্বত তার উন্নত মস্তক নত করে রেখেছেন। এ যেন দুর্বিনীত দুঃসাহসিক এক পরাশক্তি। এই শক্তির কাছে যে কোনো অন্যায়কারী বিনয়ের সাথে আপোষ করতে বাধ্য।

‘বিদ্রোহী’ কবিতার মধ্যে যুবসমাজের প্রতি ছিল কাজী নজরুল ইসলামের জাগরণী বার্তা। তিনি ছিলেন তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষে হঠাৎ গর্জে ওঠা এক ধুমকেতু। তিনি দাসত্বের বিরুদ্ধে, শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে, জরা-জীর্ণ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার কথা বলেছেন:

‘বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি/চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ছাড়ি’

‘বিদ্রোহী’ কবিতা জন্মের ১০০ বছর পরও মনে হয় কবিতাটি যেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে লেখা। যদিও বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কবিতাটি লেখা হয়েছিল। তবে এর আবেদন সর্বকালীন। সম্পূর্ণ কবিতার প্রতিটি স্তবক পরিলক্ষিত করলে দেখতে পাওয়া যায়, এর প্রতিটি ছত্রে পৌরাণিক রূপক শব্দ নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন রয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনার দ্যোতনা, তেমনি রয়েছে ধর্মীয় মিথ এবং গণমুক্তির স্লোগান। এছাড়াও রয়েছে শব্দের সংমিশ্রণ। কবিতার প্রতিটি লাইনে ছন্দের সঙ্গে বর্ণ মিলনের এক অপূর্ব ব্যবহার দেখা যায়। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে আরবি, ফার্সি, উর্দু, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার বহু শব্দ।

‘ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া/খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া/উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতৃর’

অভাবের মধ্যে বেড়ে ওঠা নজরুলের মধ্যে কি করে শব্দের কঠিন ব্যঞ্জনার জন্ম হতে পারে, বিদ্রোহী কবিতার জন্ম না হলে বোধ করি জানা হতো না। তিনি ছিলেন সর্বজ্ঞানের অধিকারী। মক্তবে পড়ুয়া নজরুলের গ্রিক বা ভারতীয় মিথের উপর দখল দেখে যে কেউ বিস্মিত হবে। উপরিউক্ত স্তবকে ভূলোক, দ্যুলোক, গোলক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে হিন্দু ধর্মীয় মতে ভূলোক মানে পৃথিবী, এবং দ্যুলোক মানে স্বর্গকে নির্দেশ করা হয়। এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। তিনি গোলক অর্থাৎ বিষ্ণুলোক ছাড়িয়ে যাবার প্রত্যয় দেখিয়েছেন। ভারতীয় মাইথলজি মতে স্বর্গে যে স্থানে বিষ্ণু বা কৃষ্ণ বসবাস করেন। আরও একটু ব্যাখ্যা করলে বলা যায়

রাধা-কৃষ্ণ যে স্থানে বসবাস করেন সেটাই গোলকধাম। তিনি হিন্দু মিথের সঙ্গে ইসলামের সংমিশ্রণে দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'আরশ' বলতে বোঝানো হয়েছে খোদা যেখানে বসবাস করেন। অর্থাৎ মনুষ্য সৃষ্টির বাইরের জগতে খোদার বসবাস। যে স্থান সব থেকে উপরে। কবি সেই স্থানকে ভেদ করে আরও উপরে উঠতে চেয়েছেন। শব্দের মাধুর্যতাই নয়, তিনি ধর্মের সঙ্গেও রেখেছেন যোজনা। তাইতো বলেছেন:

'আমি চিরদুর্দম, দূর্বিনীত, নৃশংস/মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লন, আমি ধ্বংস/আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর'

এই ছত্রে ব্যবহৃত 'নটরাজ' শব্দটিও এসেছে কৈলাশ বা শিব বা মহাদেবের সমার্থক হিসেবে। প্রকৃতিতে যখন কোনো অন্যায় ঘটে তখন কৈলাশ শৃঙ্গে ধ্যানরত শিবের ধ্যান ভঙ্গ হয়। তিনি তখন প্রলয় নৃত্য করেন। হিন্দু শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, গাজাসুর ও কালাসুরকে বধ করার পর মহাদেব তাণ্ডব নৃত্য নেচেছিলেন। বর্তমান নৃত্যকলার তাণ্ডব নৃত্যের উদ্ভাবক মহাদেবকে তাই নটরাজ ডাকা হয়ে থাকে। কবি নিজেকে নটরাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হিন্দু ধর্মীয় উপাখ্যান থেকে আরও জানা যায়, অত্রি বংশের অত্যাচারী রাজা বেন-এর মৃত্যুর পর তার ডান বাহু থেকে জন্ম নিয়েছিল এক সন্তান। তার নাম পৃথ্বিরাজ। তিনি নিজেকে অজেয় ঘোষণা করতে বিশ্বভ্রমণ করেছেন।

'বিদ্রোহী' কবিতায় ব্যবহৃত উপমা সত্যি মুগ্ধ করার মতো। যথাযথ উপমার সঙ্গে তাল-লয়ের এক ছন্দের সংমিশ্রণ কবিতাটিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করেছে। কবিতার মধ্যে কান পেতে শোনা যায় বিদ্রোহের দামামার মধ্যে এক সূক্ষ্ম করুণ ক্রন্দন।

'আমি দূর্বার/আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার/আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল/আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল'

আজন্ম পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশ-জাতিকে মুক্তি দিতে মরিয়া ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাই তো কবিতার পরতে পরতে ছন্দের অলঙ্কারে অস্বীকার করেছেন ব্রিটিশদের দেওয়া সকল নিয়ম-কানুন। কঠিন কঠোর ভাষায় উচ্চারণ করেছেন:

'আমি ভরা-তরী করি ভরাডুবি, আমি টর্পেডো আমি ভীম ভাসমান মাইন'

মহাভারতে দেখতে পাওয়া যায়, পঞ্চপাণ্ডবদের ভাই ভীমকে দুর্যোধন হত্যার জন্য খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে জলে ফেলে দিয়েছিলেন। তবে নাগরাজের কৃপায় তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। বেঁচে যাওয়ার পর আরও শক্তিশালী হয়েছিলেন। যে কারণে কবি নিজেকে ভীম শক্তির মতো ভাসমান মাইন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

'আমি ছিন্নমস্তা চন্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী'

দশ মহাবিদ্যার অনন্য এক ভয়ঙ্কর রূপ হচ্ছে ছিন্নমস্তা। অসুর বধের সময় দেবী দুর্গার ভয়ঙ্করী চন্ডী রূপ ছিন্নমস্তা রূপে আবির্ভূত হন। কবি নিজেকে ছিন্নমস্তা চন্ডী রূপি সর্বনাশী কল্পনা করেছেন।

'আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার'

পিতৃ আজ্ঞা পালন করতে পিতার আদেশে নিজ মাতাকে কুঠারের আঘাতে হত্যা করেন পরশুরাম। কবি নিজেকে পরশুরামের কুঠারের মতো নিষ্ঠুর হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

'আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি'

গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রখরতায় চারিদিক শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায়। তৃষ্ণার্ত জীব তার তীব্র তৃষ্ণা মেটাতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। কবি নিজেকে এই তীব্র তৃষ্ণার্তের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন নিদাঘ তিয়াশা অর্থাৎ গ্রীষ্মের তীব্র তৃষ্ণার মতো তিনি কঠিন।

'আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস/আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ'

আরবের ভবঘুরে এক জাতিকে বেদুঈন বা যাযাবর জাতি বলা হয়। তাদের সাধারণত বসবাসের কোন নির্দিষ্ট স্থান থাকে না। তাদের কোন পিছুটান নেই বলে কারো ধার ধারে না। অন্যদিকে কবি নিজেকে চেঙ্গিস খানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মঙ্গোলিয়ান দুর্ধর্ষ সমরনায়ক ছিলেন সম্রাট চেঙ্গিস খান। যুবক বয়সে স্ত্রীকে অন্য গোত্রের প্রধান অপহরণ করে নিয়ে যায়। নিজের বুদ্ধি দিয়ে অপহরণকারী গোত্রকে নৃশংসভাবে পরাস্ত করে নিজ স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনেন। পরবর্তীতে চেঙ্গিস খান নিজ কৌশল, বুদ্ধি আর শক্তি দিয়ে অর্ধ-বিশ্ব জয় করেন। এখানে দুটি আলাদা স্বত্তার একই প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। তারা দুই শ্রেণিই কারো কাছে মাথা নত করে না।

'আমি অর্ফিসিয়াসের বাঁশরী'

অর্ফিয়াস একটি গ্রিক পৌরাণিক চরিত্র। তিনি বাদ্যযন্ত্রে সুর তুলতেন এবং এই সুরের মূর্চ্ছনায় পাথরের প্রাণ সঞ্চারন করতেন। অর্থাৎ কবি নিজেকে সেই বাঁশরির সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর তাঁর মধ্যকার প্রতিভা দিয়ে নিষ্ঠুর শোষকের মনে মানবতা জাগ্রত করবেন।

'আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার'

ইসলাম ধর্মমতে কেয়ামত বা মহাপ্রলয় শুরুর আগে ইস্রাফিল নামের এক ফেরেস্তা শিঙ্গা বাজাবেন। এই শিঙ্গার বিকট শব্দে মহাবিশ্ব দুলে উঠবে। স্রষ্টার সৃষ্টি একে একে বিনষ্ট হতে থাকবে। সেই ইস্রাফিলের শিঙ্গার হুঙ্কারের সাথে নিজেকে তুলনা করেছেন।

'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন'

ভৃগুকে ধনুর্বেদ বিদ্যার জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। একবার দেবতারা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করতে ভৃগুও শরণাপন্ন হন। পরীক্ষায় একে একে ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর উত্তীর্ণ হন। তবে বিষ্ণুকে পরীক্ষা করতে গোলকধামে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি তখন বিষ্ণুর বুকে পদাঘাত করেন। পরে অবশ্য বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সেই থেকে বিষ্ণু দেবতার বুকের ডান পাশে ভৃগুর পদচিহ্ন আঁকা রয়েছে।

বিদ্রোহী কবিতায় কবি প্রতিটি শব্দ এক একটি রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। ভগবান বলতে মূলত শাসক গোষ্ঠীকেই বোঝানো হয়েছে। শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি জাগতিক শ্রেষ্ঠত্ব দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছেন। যার কারণে তৎকালিন ধর্মান্ধ-ধর্মদ্রোহীরা এই কবিতার প্রতিবাদ করেছিলেন। ভগবানের বুকে পদচিহ্ন এঁকে দেওয়ার মতো দুঃসাহসিক কবির বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছেন।

কাজী নজরুল ইসলামের ১৩৯ পঙক্তির বিদ্রোহী কবিতায় রয়েছে বিভিন্ন বক্তব্য। তার মধ্যে রয়েছে; সর্বোচ্চ শক্তিময় ও বিজয়ের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা। প্রতিহিংসার প্রত্যক্ষ ভয়ঙ্কর রূপ। নিজেকে পরিবর্তিত করে সংহারী রূপে ব্যক্ত করা। মানবীয় প্রত্যাশা। ভারতীয় মিথ, ঐতিহাসিক চরিত্র, বেদ, পুরাণ, আল-কোরআন। নিজের প্রতি বিশ্বাস অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস।

১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি 'বিজলী' পত্রিকায় সর্বপ্রথম 'বিদ্রোহী' কবিতা ছাপা হয়। ছাপা হওয়ার পরেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাওয়ায় ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ৮টি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। জনশ্রুতি আছে, বিদ্রোহী কবিতাটি প্রকাশ হওয়ার পর নজরুল জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্বকণ্ঠে শুনিয়েছিলেন। আবেগে আপ্লুত হয়ে কাজী নজরুল বলেছিলেন, 'গুরুদেব আমি আপনাকে খুন করবো খুন'। রবীন্দ্রনাথ বুকে জড়িয়ে নজরুলকে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ কাজী তুমিই পারবে আমাকে খুন করতে'। সেদিন থেকে আমৃত্যু দুজনের গুরুশিষ্য সম্পর্ক অটুট ছিল। কিছুদিন পর জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকা বিদ্রোহী কবিতা নিয়ে নজরুলের প্রথম কাব্যগন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয়। এত জনপ্রিয়তা পাওয়া কবিতা বোধকরি আর কখনো বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হয়নি।

ব্রিটিশ শাসনে শৃঙ্খলিত ভারত উপমাহাদেশে জন্ম নিয়ে নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন, স্বাধীনতাই একমাত্র মুক্তির পথ। ইতিহাস থেকে জানা যায় বিদ্রোহী কবিতা জন্মের আগে, ব্রিটিশ-বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে সারা ভারতবর্ষ তখন টালমাটাল। বাংলার রাজনীতিতে বারুদের গন্ধ। দেশের যুবসমাজ তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের বেদিমূলে আত্মাহুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই যুবসমাজের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। অবিভক্ত ভারতবর্ষে পরাধিনতার গ্লানি ঘোচাতে নজরুলের ঘরে জন্ম নিয়েছিল বিদ্রোহী কবিতা। তিনি জাতীয়তাবাদে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিদ্রোহী কবিতায় ব্রিটিশ বিরোধিতার ছাপ তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠেছে।